১৬ অগাস্ট ২০২৬

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে *অধিকার* এর বিবৃতি

গত ১০ অগাস্ট মন্ত্রিসভা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের খসড়া অনুমোদন করে।জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০২৬ এর খসড়াটি সংসদে পাশ হলে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের বদলে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে বলে *অধিকার* মনে করে।

ফ্যাসিবাদী হাসিনার দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। বিরোধীদলের নেতা-কর্মী, ভিন্নমতাবলম্বী এবং সাধারণ নাগরিকরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, গণগ্রেপ্তার ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরণের নিপীড়নের শিকার হলেও তৎকালীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যাতে দলীয় আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় এবং প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী একটি শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন হিসেবে কাজ করতে পারে সেই লক্ষ্যে গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছিল । কিন্তু বিএনপি সরকার অধ্যাদেশটি সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন না করায় অধ্যাদেশটি বাতিল (ল্যাপসড) হয়ে যায়।

সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০২৬ এর যে খসড়া মন্ত্রী পরিষদ অনুমোদন করেছে সেখানে প্যারিস নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী কমিশনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং যেকোনো বক্তব্য গ্রহণ ও যেকোনো তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হতে হবে। কিন্তু অনুমোদিত খসড়া আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী কমিশন শৃংখলা বাহিনী বা তার কোন সদস্য কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিজ উদ্যোগে প্রথমেই তদন্ত করতে পারবেনা। কারণ হাসিনার আমলের মত মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তের দায়িত্ব শৃংখলা বাহিনীকেই দেয়া হয়েছে। ফলে অতীতের মতই এইসব তদন্ত নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু হবে না বলে অধিকার মনে করে। ফলে অভিযুক্ত বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করবে।

প্যারিস নীতিমালায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিয়োগের বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নীতিমালায় সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। তবে নিয়োগের পদ্ধতি যাই হোক না কেন, তা অবশ্যই সমাজের বহুত্ববাদী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, যদি সরকারি দপ্তর বা বিভাগগুলো এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকে,তাহলে তাদের প্রতিনিধিদের ভূমিকা কেবল পরামর্শমূলক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।অথচ দেখা যাচ্ছে যে ২০২৬ সালের কমিশনের নিয়োগের জন্য খসড়া আইনে প্রস্তাবিত বাছাই কমিটির যে কাঠামোর কথা বলা

হয়েছে, তাতে সরকারিদলেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবে এবং সরকারি সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে। অনুমোদিত আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত নয় সদস্যের এই বাছাই কমিটিতে জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের দুজন মন্ত্রী, সরকারীদলের একজন সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীপরিষদ সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এর বাইরে অন্য যে চারজন সদস্য রাখার বিধান রাখা হয়েছে, বাস্তবে তাদের মধ্যে তিন জনের মনোনয়নও সরকারের হাতে রয়েছে। কারণ এদের দুইজন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং একজন মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত হবেন বলে এই আইনে উল্লেখিত রয়েছে। অর্থাৎ বাছাই কমিটির ৯ জনের মধ্যে ৮ জনই সরকার সংশ্লিষ্ট হবেন।এছাড়া বাছাই কমিটিতে আলাদা ভাবে নারীর কোন প্রতিনিধিত্ব উল্লেখ করা হয়নি যা বৈষম্যমূলক ।

অধিকার মনে করে ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের সঙ্গে তুলনা করলে নতুন খসড়া আইনে এমন কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে, যা একটি স্বাধীন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের জন-আকাঙ্খা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থী এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্যারিস নীতিমালার মানদণ্ডের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাই উল্লেখিত বিষয়াবলী সংশোধন করে প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০২৬ প্রনীত হলে তা মানবাধিকার লঙঘন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে । এছাড়াও সরকারের ইমেজ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করবে।

বার্তা প্রেরক

অধিকার টিম